শ্রেষ্ঠ গল্প

শ্রেষ্ঠ গল্প

সতীনাথ ভাদুড়ী

KOBI PROKASHANI

শ্রেষ্ঠ গল্প
সতীনাথ ভাদুড়ী

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ২০২৪

প্রকাশক
সজল আহমেদ
কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট
২৫৩-২৫৪ ড. কুদরত-ই-খুদা রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ
সব্যসাচী হাজরা

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
৪৮৩-৪৮৬ গাউসুল আজম সুপার মার্কেট নীলক্ষেত ঢাকা ১২০৫

ভারতে পরিবেশক
অভিযান বুক ক্যাফে বুকস অফ বেঙ্গল বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং কলকাতা

মূল্য : ৫০০ টাকা

Shreshtha Golpa by Satinath Vaduri Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market 253-254 Dr. Kudrat-e-Khuda Road Katabon Dhaka 1205
First Edition: October 2024
Phone: 02-44617335 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price: 500 Taka RS: 500 US 25 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-99198-0-3

ঘরে বসে কবি প্রকাশনীর যেকোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

সতীনাথ ভাদুড়ীর অনুরাগীদের উদ্দেশে

সূচিপত্র

গণনায়ক ৯
বন্যা ২৭
আন্টা-বাংলা ৪৪
ষড়যন্ত্র মামলার রায় ৫৭
চকাচকী ৭১
বৈয়াকরণ ৮০
ডাকাতের মা ৯৪
মুনাফা ঠাকরুণ ১০২
পত্রলেখার বাবা ১১০
বাহাত্তুরে ১২২
অভিজ্ঞতা ১৩৮
চরণদাস এম. এল. এ. ১৫৩
দাম্পত্য সীমান্তে ১৬৯
অলোকদৃষ্টি ১৭৮
জোড়-কলম ১৮৭
বয়োকমি ১৯৬
জামাইবাবু ২০৭
ওয়ার কোয়ালিটি ২০৯
দিগ্‌ভ্রান্ত ২১৪
বমি-কপালিয়া ২২৪

পরিশিষ্ট : প্রাক্‌কথন ২৩২

গণনায়ক

পূর্ণিয়া জেলার গোপালপুর থানা, আর দিনাজপুর জেলার শ্রীপুর থানার মধ্যের সীমারেখা 'নাগর' নদী। পার্বত্য 'নাগর' এখানে খুব খামখেয়ালি নয়। তাই তার সোহাগের অজস্রতার ওপর রূঢ় ঔদাসীন্য দেখিয়ে আজও দাঁড়িয়ে থাকতে পেরেছে, কাঠের নড়বড়ে পুলটি। আগেকার যুগে উত্তর বাংলা থেকে উত্তর বিহারে ফৌজ পাঠাবার যে পথ ছিল, তারই ওপর ছিল এই সেতু। সেই রাস্তা এখনও পুলের দুদিকেই আছে; কিন্তু তার সে জলুস আর নেই। কেবল গত বছর কয়েক থেকে গোপালপুর থানার আরুয়াখোয়ার হাট জমে উঠেছে যুদ্ধ আর যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতির দৌলতে—বিহার আর বাংলার মধ্যের বেআইনি জিনিসের কেনা-বেচায়। পুলের পশ্চিমেই আরুয়াখোয়ার হাট। এই হাটের গা ঘেঁষে চলে গিয়েছে আর একটা রাস্তা, মালদা জেলা থেকে আরম্ভ করে পূর্ণিয়া, জলপাইগুড়ি জেলা হয়ে একেবারে শিলিগুড়ি পর্যন্ত। অগণিত মাল বোঝাই গরুর গাড়ি মালদা, দিনাজপুর, আর জলপাইগুড়ি তিনদিক থেকে পুলের সম্মুখে এসে মিলিত হয়। গত বছর হাটের ইজারাদারের কাছ থেকে, বকরিদের আগে শান্তিরক্ষার মুচলেকা নেওয়ার জন্য এসে, এস. ডি. ও. সাহেবের মোটরকার যায় পথে আটকে। তারপর থেকে পথের গর্তগুলো বুজেছে।

বাইরের জগতের সঙ্গে সম্বন্ধ ষোলো মাইল দূরের সুধানী স্টেশন থেকে। চোরাকারবারের কেন্দ্র আরুয়াখোয়া বাজার থেকে পুল পার হয়ে যায় গরু, মোষ চিনি, ঘি, আর বাংলাদেশ থেকে আসে চাল আর ধান।

হিন্দু-মুসলমানের মিশ্রিত জনসংখ্যা। হিন্দুদের মধ্যে অধিকাংশই রাজবংশী। গত বছরের কলকাতা, নোয়াখালী আর বিহারের নানা প্রকার বিকৃত খবর, তাদের মনে গভীর রেখাপাত করেছিল ঠিকই; কিন্তু এর চিড়খাওয়া মনও কয়েক দিনের মধ্যে জোড়া লেগে গিয়েছিল। গতানুগতিকতার তাগিদে, পেটের ধান্দায় জোড়াতালি দেওয়া জীবন একরকম কেটে যাচ্ছিল; কিন্তু সেই পুরনো ফাটল দিয়ে ভাঙন ধরল হঠাৎ।

সুধানী-গোলার জহুরমল ডোকানিয়ার 'মুনীম' (গোমস্তা) এক শনিবারের রাতে আরুয়াখোয়া হাটে গাড়ি নিয়ে যাচ্ছেন। চিনির বস্তাগুলোর ওপর ত্রিপল বিছানো। রাতে খেয়ে-দেয়ে গাড়ি চড়লে আরুয়াখোয়ায় গাড়ি পৌঁছুবে কাল সকালে।

বিড়িটায় শেষ টান মেরে ছোট অবশিষ্টটুকু গাড়োয়ানকে দেয়। বিলট্ গাড়োয়ান খুশি হয়ে ওঠে।

'গামছা বিছিয়ে শুয়ে পড়ুন মুনীমজি। একেবারে আরুয়াখোয়ায় উঠবেন। ঘণ্টায় কোশ যায় গরুর গাড়ি, দূরের সফরে। আর ধরুন রাতবিরাতের জন্য এক ঘণ্টা ফাজিল রাখলাম। সকাল এক প্রহরের সময়, আরুয়াখোয়ায় গিয়ে দাঁতন করবেন।'

মুনীমজি আজকে খুব খুশি আছেন। তিনি যাওয়ামাত্র সকলেই তাঁর কাছে দেশের 'হালচাল' জিজ্ঞাসা করে। পথে যার সঙ্গে দেখা হয়, এমনকি কন্সী এল. পি. স্কুলের গুরুজি পর্যন্ত তাঁর কাছে খবর জিজ্ঞাসা করে। একে অতবড় গোলার লেখাপড়া জানা মুনীম; তার ওপর তাঁর মালিকের বাড়িতে 'বিজলী'তে খবর আনাবার কল আছে। সেই কলে লাটসাহেব পর্যন্ত ডোকানিয়াজির সঙ্গে কথা বলেন, কত লোক কত খবর সেখানে দেয়, কত আওরৎ তাঁকে খুশি করবার জন্য গানবাজনা শোনায়। কাজেই মুনীমজির কথার গুরুত্ব স্থানীয় লোকদের কাছে অনেকখানি।

'দেখিস রাতে কেউ যদি জিজ্ঞাস করে কী নিয়ে যাচ্ছিস, তাহলে বলিস, আলু; আলুর বোরাটা সম্মুখে আছে তো?'

'জি'।

'আমি পিছনেই শুই চিনির বস্তাগুলোর ওপর। সম্মুখের দিকে চিনির বস্তাগুলো রাখতে পারলে একটু আরামে শোয়া যেত, ঝাঁকানি কম লাগত।'

'জি'।

'মীরপুরে একটু সাবধানে থাকিস। ওখানকার গ্রাম এডভাইজরি কমিটির সেক্রেটারি ভারি বজ্জাত। তার ওপর আজকাল দুনিয়াসুদ্ধ সকলে সেক্রেটারি হয়ে উঠেছে, দেখিস না? ওখানে কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলে আমাকে ডেকে দিবি। ও গাঁখানা দিয়ে যাবার সময় চিৎকার করে গান গাইতে গাইতে যাস; চুপচাপ গেলেই সন্দেহ করবে। অনর্থক কতকগুলো টাকা খরচ। গাঁয়ের সেক্রেটারির দাম গড়ে টাকা দশেক। মীরপুরেরটাকে কিনতে টাকা পঞ্চাশের কম লাগবে না। সাবধান।'

'সে আর আমায় বলতে হবে না হুজুর। আপনি শুয়ে পড়ুন। আমি খুব হেফাজত করে চালাব; খানা গর্ত বাঁচিয়ে।'

মুনীমজির ঘুম আর আসে না। যে খবর তিনি নিয়ে যাচ্ছেন, তা শুনলে হাটসুদ্ধ লোক চমকে যাবে। এমন জবর খবর বহুকাল এ মুল্লুকের লোক শোনেনি।—না, চিনির বস্তার পিঁপড়েগুলো আর ঘুমোতে দেবে না। ঐ হাঁদাগঙ্গারাম বিলট্টা কি বস্তাগুলো তুলবার সময় ঝেড়েও তোলেনি!

'এই বিলট্ ঢুলছিস নাকি?'

'না, এই একটু চোখের পাতা ভারী হয়ে আসছিল হুজুর।' মুনীমজি জানেন যে এইবার বিলট্ আমতা আমতা করে বিড়ি চাইবে ঘুম ভাঙানোর জন্য। আর করেই

বা কী বেচারি—সারা রাত জাগতে হবে তো?—বিলট্ আবার ঐ ভাসাভাসা শোনা খবরটা পথের লোকদের দিতে দিতে না যায়।

'এই বিল্টা। এই নে, দেশলাই রাখ। আর আজকের সুধানীতে শোনা খবরটা কাউকে বলিস না যেন।' বিলট্ এতক্ষণ খবরটি সম্বন্ধে কিছুই ভাবেনি। মুনীজির কথার পর খবরটা মনে করবার চেষ্টা করে।—

'না না, মুনীমসাহেব, সে আর আমায় বলতে হবে না। এতকাল আপনাদের নুন খাচ্ছি, কোনোদিন খবর বলতে শুনেছেন? গরিব মানুষ, আমাদের খবর দিয়ে দরকার কী?'

প্রসন্ন মনে সে বিড়ি আর দেশলাই নেয়। তারপর বাঁয়ের বলদের লেজ মুড়তে মুড়তে তার নিকট আত্মীয়ার উদ্দেশে গালি দিতে আরম্ভ করে।

মুসহর সাওয়ের দোকানের সম্মুখে গাড়ি পৌঁছায় প্রায় বেলা দশটার সময়।

'রাম রাম মুনীমজি।'

'জয়গোপাল! জয়গোপাল।'

মুসহর সাও আর তার ছেলে, গাড়ি থামাবার সঙ্গে সঙ্গে চিনির বস্তাগুলো বাড়ির আঙিনার ভিতর নিয়ে রাখে—এখনই আবার অন্য লোকেরা এসে পড়বে।—

'চার বোরা মোটে?'

'কত ধানে কত চাল, তার তো হিসাব রাখো না! ঐ আনতেই হিমশিম খেয়ে যেতে হয়। যা দিনকাল পড়েছে, মিলের ছাপমারা বোরার ওপর অন্য বোরা ঢুকিয়ে, ডবল বস্তার মধ্যে কোনোরকমে আনা।'

আলুর বোরাটা দোকানের সম্মুখেই নামিয়ে রেখে সাওজি বলে, 'এবার বলুন হালচাল।'

মুনীমজি গম্ভীর হয়ে যায়; প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে দাঁতন আনতে বলেন। সাওজি বোঝে, আজ কিছু জবর খবর আছে। একে একে লোক জমতে আরম্ভ করে। বেশির ভাগই দোকানদার; দু-চারজন দূর গাঁয়ের লোক, যারা চালের গাড়ি নিয়ে এসেছে হাটে। অজস্র 'রাম রাম মুনীমজি'র প্রত্যাভিবাদন ইঙ্গিতে সেরে মুনীমজি একমনে দাঁতন করতে থাকেন; ভাবে মনে হয়, সংসারে তাঁর দিকদারি ধরে গিয়েছে! সকলে উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করে—কতক্ষণে তাঁর মুখ ধোয়া শেষ হবে, কতক্ষণে তাঁর মুখের দুটো কথা শুনতে পাবে।—এইবার গামছা দিয়ে মুখ মুছছেন; আবার স্নানের জন্য তেল চাইবেন না তো—।

অন্যদিন হলে সাওজি স্নানের কথা তুলত; এখন ইচ্ছা করেই খবর শোনবার লোভে সে কথা ওঠায় না। মুনীমজি বিলট্ গাড়োয়ানকে দুইজনের জন্য দই-চিড়ে কিনবার পয়সা দেন।

'ভালো দেখে গুড়ও কিছু আনিস; চিনি তো আর পাওয়ার জো নেই এক চিমটি, এই যবে থেকে কংগ্রেস মিনিস্ট্রি হয়েছে।'

তারপর মুনীমজি সমবেত লোকদের দিকে না তাকিয়ে, ট্যাঁকে কয়েকটি অবশিষ্ট খুচরো পয়সা গুঁজতে গুঁজতে বলেন, 'আর কী, দিনাজপুর জেলা তো পাকিস্তান হয়ে গেল।' কথার সুরে মনে হয় এ একটা সাধারণ খবর, হামেশাই এরকম বহু জেলা পাকিস্তান হয়ে থাকে। এতক্ষণে তাঁর সম্মুখের লোকদের দিকে তাকাবার অবকাশ হয়। ভঙ্গিতে আত্মপ্রত্যয় ফুটে বেরুচ্ছে, কোনো বিশ্ববিশ্রুত দেশনায়ক সাংবাদিকদের বৈঠক ডেকেছেন যেন।

মুহূর্তের জন্য সকলে নীরব হয়ে যায়। শ্রীপুরের রাজবংশী দর্পণ সিং-এর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। আর সকলের বুক ঢিপ ঢিপ করে—না জানি তার জেলার কী হয়েছে; এইবার বুঝি মুনীমজি তাঁর গাঁয়ের কথা বলবে। সাওজির মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে ভয়ে;—তার দোকান, স্ত্রী, পুত্র, পরিবার? সে সাহসে বুক বেঁধে জিজ্ঞাসা করে—'আর আমাদের আরুয়াখোয়া?'

'আরুয়াখোয়া তো পূর্ণিয়া জেলা হিন্দুস্থানে। এ তো আর বাংলামুলুক নয়—এ হচ্ছে বিহার। এখানে আর কারও টু ফ্যাঁ চলবে না।'

হাটের দোকানদাররা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচে। মুনীমজি একসঙ্গে খবর বলে ফেলেন না—আস্তে আস্তে টিপে টিপে খবর ছাড়েন। এতগুলো লোক উদগ্র উৎকণ্ঠায় তাঁর দিকে চেয়ে রয়েছে, লাটসাহেবের বেতার-বক্তৃতার মতো তাঁর কথার দাম আছে এখানে। এই সময়টুকুকে যত টেনে বড় করা যায়—এই মানসিক বিলাসের মোহ কম নয়।

দূরের হাটুরেরা চালের গাড়ি নিয়ে সকলের চেয়ে আগে আসে। তাদের মধ্যে থেকেও অনেকে এসে জমেছে এখানে।

অছিমদ্দী জিজ্ঞাসা করে, 'মীরপুর কোথায় পড়ল হুজুর?'

'মীরপুর কোন জেলায়?'

কাঁদো কাঁদো হয়ে অছিমদ্দী বলে, 'হরিশচন্দ্রপুর থানা।'

সাওজি বলে দেয়—'ও হলো মালদা জেলা।'

'মালদা জেলা পড়েছে পাকিস্তানে।'

আল্লার এই অসীম করুণায় অছিমদ্দী এত অভিভূত হয়ে পড়ে যে, সে আর কোনো কথা বলবার ভাষা খুঁজে পায় না।

বজরগাঁর পোড়াগোঁসাই ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসেন। ইনি রাজবংশীদের পুরোহিত। এই এলাকায় এঁর অনেক যজমান। সাওজি উঠে এঁকে খাটিয়ায় বসতে দেন। তাঁর কিন্তু সেদিকে খেয়াল নেই। একেবারে মুনীমজির সম্মুখে যেতে যেতে প্রশ্ন করেন—'আর বজরগাঁ? তিতলিয়া থানা, জলপাইগুড়ি জেলা?'

'বাবাজি, আপনি জলপাইগুড়ি জেলার চিন্তা করবেন না। রামজির আশীর্বাদে ওটা হিন্দুস্থানেই পড়েছে।'

'পড়বে না? বাপ-পিতামর আমল থেকে আমরা রয়েছি বজরগাঁয়। পাকিস্তানে চলে গেলেই হলো! জল্পেশ্বরের এলাকা, মহাকালের রাজ্য, চলে যাবে পাকিস্তানে? বড়লাট ভারি সমঝদার লোক। নারায়ণ! নারায়ণ!'

নারায়ণকে প্রণাম করবার সময় অছিমদ্দীর দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। কৌতূহল ও উদ্বেগের মধ্যে এতক্ষণ সকলে তার অস্তিত্বের কথা ভুলে গিয়েছিল। এখন সকলেই তার দিকে তাকানোয়, সে সংকুচিত হয়ে পড়ে।—এক কাসেম ছাড়া আর সকলেই তাকে অপরাধী মনে করছে। তার গাঁয়ের আসগর আলী পত্তনিদারই নিশ্চয় চেষ্টা করে তার গাঁকে পাকিস্তানে নিয়ে গিয়েছে!—

খবরটায় তার আনন্দ হয়েছে এইটুকু তার অপরাধ। তবুও সে বোঝে যে, সে এখানে অবাঞ্ছিত। সে কাসেমকে হাত ধরে বাইরে নিয়ে যায়। দূরে তাদের গাড়ির কাছে গিয়ে অছিমদ্দী একগাল হেসে বলে, 'বাপকা ব্যাটা আসগর আলী পত্তনিদার; কথা রেখেছে। চল, তাড়াতাড়ি ধান বেচে—যা দাম পাওয়া যায়। গাঁয়ে গিয়ে পত্তনিদারের সঙ্গে দেখা করে শোকরিয়া জানাতে হবে।'

কাসেম বলে, 'এখনই ফিরে চল; ভয় করে হাটে আজ এদের মধ্যে।'

'ধান না বেচলে ওষুধ কিনবি কী দিয়ে? একবার খরচ করে দুজেলার চাল ধরার পুলিশদের মণপিছু দুটাকা করে দিয়েছিস। ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হলে আবার ঐ খরচ করতে হবে। এদিকে রোজগারের নামে খোঁজ নেই। এখানে হাজিসাহেব হাটের ইজারাদার। ভয়টা কীসের শুনি? গোলমাল হলে লেঠেল দিয়ে ঠাণ্ডা করে দেবে না!'

কাসেম সাহসে ভর করে ইজারাদারের কাছারিতে যায়—হাজার হোক মুসলমান তো ইজারাদার সাহেব! আগে হলে কাসেমের এ সাহস হতো না; কিন্তু গত বছর বিহারের কাণ্ডের পর মুসলমান আর মুসলমানের কাছে যেতে ভয় পায় না। কাসেম দেখে যে, সেখানে আরও অনেকে বসে রয়েছে। সকলেই ইজারাদারকে শাসাচ্ছে। ইজারাদার সাহেব সকলকে শান্ত করেন। দূরের লোকদের তখনই বাড়ি ফিরতে বলেন। 'চারদিকে হিন্দু বস্তি। সকলে খুব সাবধানে থাকবে। রাতে পালা করে জাগবে। কিষাণগঞ্জ সাবডিভিশন হিন্দুস্থানে গেলেই হলো! এর আমি বিহিত করছি। খবর এখনও সঠিক পাওয়া যায়নি। ঐ মুনীমটার কথায় বিশ্বাস কী?'

কাসেম আর অছিমদ্দীর মনে শেষের কথাটা ছ্যাঁৎ করে লাগে। দুজনেই একসঙ্গে কথাটার প্রতিবাদ করে ওঠে। উপস্থিত সকলে কটমট করে তাদের দিকে তাকায়। তারা তাড়াতাড়ি ইজারাদার সাহেবকে তাদের ধানটা কিনে নিতে বলে—যেকোনো দামে হোক। নিজের 'মঝবে'র লোকের জন্য ইজারাদার সাহেব দরকার না থাকলেও তাদের ধানটা কিনে নিতে কর্মচারীকে আদেশ দেন। 'দরটা ঠিক করে নিও, মাসুম, বুঝলে।' মাসুম পুরনো কর্মচারী—সে মনিবের ইঙ্গিত ঠিক বোঝে।

ইজারাদার সাহেব সকলকে বোঝান। 'আরে মিয়া, লাটসাহেবের কথাও বদলায়—ঠ্যালায় ফেলতে পারলে। আমি আজ রাতেই যাচ্ছি সদরে। পাঁচশ টাকা চাঁদা নিয়ে গেল জেলা পাকিস্তান কনফারেন্স—সদর সাহেব কত রকমের কথা বললেন, আর চলে গেলেই হলো এ জেলা হিন্দুস্থানে! কেবল কতগুলো টাকা অনর্থক খরচ হবে এই যা।'

হাট আর আজ জমল না। লোকের মুখে মুখে মুনীমজির খবর হাটের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। সাওজির দোকান লোকে লোকারণ্য হয়ে যায়। সকলেই মুনীমজির নিজের মুখ থেকে খবর শুনতে চায়। নানা প্রশ্নে সকলে তাঁকে উদ্ব্যস্ত করে তোলে। দিনাজপুর আর মালদার হিন্দু হাটুরেরা দলবেঁধে আসে তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করতে। মুনীমজি বাইরের অন্য লোকদের সরিয়ে দিতে বলেন সাওজিকে—কী জানি কোনো মুসলমান যদি থেকে যায় ভিড়ের মধ্যে। মালদা, দিনাজপুরের হিন্দুদের সঙ্গে তিনি অনেকক্ষণ একান্তে কথাবার্তা বলেন। এই বিপত্তির সময় মুনীমজির স্বতঃস্ফূর্ত সহানুভূতিতে তারা মনে বল পায়। ওদেশে থাকা আর নিরাপদ নয়; আত্মীয়-পরিজনদের বাড়ি থেকে সরাতে হবে। তারা আর অপেক্ষা না করে হাট ভালোভাবে বসবার আগেই ফিরে যেতে চায়। আদ্রস্বরে মুনীমজি তাদের বলেন যে, তাদের এক মুহূর্ত দেরি করা উচিত নয়। তাদের সনির্বন্ধ অনুরোধে তিনি তাদের সব চাল কিনে নেন—ষোলো টাকা দরে। গত হাটে চালের দাম ছিল উনিশ, কাল সুধানীর বাজারে ছিল বাইশ।

খানিক পরে ইজারাদার সাহেবের সেপাই খবর দেয় যে, তিনি মুনীমজিকে ডেকেছেন। তিনি যেতেই তাঁকে এক আলাদা ঘরে নিয়ে গিয়ে বসান ইজারাদার সাহেব। বেতারের খবর সম্বন্ধে কথাবার্তা হওয়ার পর ইজারাদার সাহেব বলেন 'আমার এ হাট এবার গেল। যাক, সে তো বরাতে যা আছে হবেই। এসব তো এখনও অনেককাল চলবে, এখন কাজের কথা হোক। আজ ক'বোরা চিনি এনেছ?'

'এনেছি চার বোরা। এক বোরা সাওজিকে দিতে হবে। তোমার তিন বোরা। এবার কিন্তু সত্তর টাকা মণ।'

'তাজ্জব কথা! এতদিন ছিল ষাট টাকা, আজ হঠাৎ দাম বাড়ালে চলবে কেন? আর সাওজিকে আধবস্তা দাও—আমাকে সাড়ে তিন বস্তা। গতবারে যে চিনি দিয়েছিলে, তা ছিল একবারে ভিজে।'

'সাওজির তো মোটে এক বস্তা—তার মধ্যেও তোমার পাকিস্তানের দাবি! সে হয় হয় না; ওকে এক বস্তা পুরো দিতেই হবে; কথার খেলাপ যেতে পারে না। আর চিনি ভিজবে কী করে? ত্রিপল দিয়ে ঢেকে আনা। হ্যাঁ, আর দুটো করে পাটের বস্তা যে বিনা পয়সায় পাচ্ছ, তার দাম কি আমি ঘর থেকে দেব নাকি? বললেই হলো, ভিজে! তার ওপর মালদা আর দিনাজপুর এখন তো পাকিস্তান হলো। সেখানে এখন তো খুব কদিন মোফিল চলবে। ঈদের জন্য চিনিও লোকে এখন থেকেই জোগাড় করবে; আড়াই টাকা সের অনায়াসে তুমি পাবে।' মুনীমসাহেবের কথার বন্যায় ইজারাদার সাহেবের যুক্তিস্রোত ঘুলিয়ে যায়; থই না পেয়ে মৃদু প্রতিবাদ জানায়। 'কী যে বলো মুনীমজি, মুসলমানের হাতে পয়সা কোথায়?'

'আচ্ছা যাও, দুটাকা কম দিও। হ্যাঁ, তবে আর একটা কাজ করতে হবে ইজারাদার সাহেব, আমাকে খানকয়েক গরুর গাড়ি ঠিক করে দিতে হবে। সুধানীর

গোলায় চাল নিয়ে যাবে। এখানে অত রাখবার জায়গা নেই। বর্ষার দিন, বাইরে পড়ে রয়েছে। তোমার হাতে আছে অনেক গাড়োয়ান।’

‘আচ্ছা সে হয়ে যাবে সব ঠিক। ভোর রাত্রে গেলেই হবে তো?’

মাসুম এসে খবর দেয় যে, ‘হাটের লোকরা ক্ষেপে গিয়েছে। তারা দলবেঁধে কাছারিবাড়ির মাঠে ঢুকেছে। তারা মুনীমজিকে ফেরত চায়—আপনি নাকি তাঁকে আর জিন্দা ফিরতে দেবেন না।’

বাইরে তুমুল কোলাহল শোনা যায়।

‘লোকগুলো পাগল হলো নাকি!’—ভয়ে ইজারাদার সাহেবের মুখ বিবর্ণ হয়ে যায়।

দুজনে একসঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। বাজারের স্থায়ী দোকানদাররা ইজারাদার সাহেবকে দেখে, হাটুরেদের সম্মুখে এগিয়ে দেয়, হাজার হোক তাদের জমিদার তো। মুনীমসাহেব এসে ক্ষুব্ধ জনতাকে শান্ত করেন। স্বর নামিয়ে সম্মুখের লোকদের বলেন, ‘ওর সাধ্যি কী আমাকে কিছু করার। তোমরা এখনও বাড়ি ফেরোনি? আজকালকার দিনে বাড়িঘর ছেড়ে যত কম থাকা যায় ততই ভালো। তোমরা তো সব বোঝোই। আমি আর কী সলা দেব! নিজের নিজের গাঁয়ের মোড়লদের সঙ্গে পরামর্শ করে, যা ভালো হয় করো।—মেয়েছেলেদের নিয়েই বিপদ। একটু হুঁশিয়ার থাকবে। আমরা তো সুধানী বাজারেও জানানাদের রাখতে সাহস পাইনি—সব রাজপুতানায় রেখে এসেছি এই মাসে। যন্ত্রপাতির কর্ম, বলা তো যায় না, কী বলতে কী বলে। শালা লাটসাহেবের মুখ ফসকে পূর্ণিয়াটা বেরুলেই তো সব চৌপট হয়েছিল—সাবধানের মার নেই।’

রাজবংশীদের সরু সরু চোখগুলো ভয়ে বিস্ফারিত হয়ে ওঠে। ‘পোলিয়া’ মেয়েরা কান্নাকাটি আরম্ভ করে।

‘আর এখন নুন কিনতে হবে না’? ‘ওরে বাচ্চিদাই, কোন দিকে গেলি, শিগ্‌গিরি আয় না’, ‘ওঠ নবাব পুত্তুর, এখনও জাবর কাটছে!’ ‘আজ দাম চাই না, খালি তুমি ওজন করে নিয়ে রাখো’—‘এই টাকাটা মুনীমজি আমানত রাখবেন গোলায়, কাছে রাখতে ভরসা পাচ্ছি না’—

আতঙ্কমুখর পরিবেশ সুস্থ মনকেও দুর্বল করে তোলে। অল্পক্ষণের অস্বাভাবিক কর্মতৎপরতার পরই হাট নীরব হয়ে আসে।

পরের দিন থেকেই আরুয়াখোয়ার রূপ যায় বদলে। আগে সপ্তাহে একদিন হাট বসত—এখন অহোরাত্র ভয়ার্ত নরনারীর নিরানন্দ মেলা। গাড়ির পর গাড়ি আসছে পুল পার হয়ে শ্রীপুরের দিক থেকে। হেঁটে চলে আসছে দলে দলে মেয়ে, ছেলে, গরু, ছাগল। ছোট ছেলেটির মাথায় পর্যন্ত হাঁড়িকুড়ির বোঝা চাপানো। ধুঁকতে ধুঁকতে চলছে হাড়-জিরজিরে কালাজ্বরের রুগি, একটা বিড়াল কোলে নিয়ে। কাশতে কাশতে চলেছে হেঁপো বুড়ি—পাকিস্তান থেকে বাঁচতে গিয়ে প্রাণটা বেরোয় বুঝি! এতদিন ছোট্ট ছিল এদের জগৎ। আজ হাটে বিশ্রাম করে কতক যাবে এগিয়ে

শিকারের খেদানো হরিণের মতো, অনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে। কতক যাবে থেকে; যদি খেতের কাজ পায়, এই আশায়। পথে খাওয়ার অভাব কী—এখন তাল পাকার সময়।

পূর্ণিয়া আর দিনাজপুর দুটো ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের মধ্যে কোনোটাই 'নগরে'র ওপরে পুলের জন্য খরচের দায়িত্ব স্বীকার করে না। নড়বড়ে পুলটার ওপর খুব ধকল চলেছে আজ কদিন থেকে। পুলের দুদিকে ক্যাম্প পড়েছে। মুনীমজি কলকাতার এক রিলিফ সোসাইটিকে বলে-কয়ে শরণার্থীদের সুখ-সুবিধা দেওয়ার জন্য আরুয়াখোয়ায় একটি ক্যাম্প খুলিয়েছেন। লোকাল বোর্ডে খবর দিয়ে ডাক্তার আনিয়েছেন। সব কাজ হচ্ছে মুনীমজির সহযোগিতায়।

কত লোক মুনীমসাহেবের ক্যাম্পে সুখ-দুঃখের কথা বলতে আসে। তিনি কাউকে আশ্বাস দেন, কাউকে রামজির শরণ নিতে অনুরোধ করেন, কাউকে ধৈর্য ধরতে বলেন, কারও কাছে বা কংগ্রেস সরকারের দুর্বলনীতির নিন্দা করেন। তারপর রিলিফ কমিটির চিড়ে-দইয়ের স্লিপ কাটতে কাটতে বলেন, 'কজন? পাঁচ, এক বাচ্চা? আচ্ছা ঐ ঝাণ্ডাওয়ালা তাঁবুতে মোহর করিয়ে সাওজির দোকানে নিয়ে যাও। সব ঠিক হয়ে যাবে।' কৃতজ্ঞতায় শরণার্থীর মন ভরে ওঠে—এই বিপদের সময় মিষ্টি কথাই বা কজন লোক বলে!

পুলের ওপারে রেলিঙের ওপর লাগানো হয়েছে সবুজের ওপর চাঁদতারা দেওয়া লীগের ঝাণ্ডা; পুলের এদিকে দেওয়া হয়েছে কংগ্রেসি তিনরঙা পতাকা। ওদিকে একদল চিৎকার করে, 'লে লিয়া হ্যায় পাকিস্তান', 'বাঁটগেয়া হ্যায় হিন্দুস্থান'; এদিকের দল চ্যাঁচায়, 'বন্দে মাতরম্', 'জয় হিন্দ্'।

তিক্ত উত্তেজনাময় আবহাওয়া সৃষ্টি হতে দেরি লাগে না। এই বুঝি কোনো কাণ্ড হয় হয়! এদিকে গুজব ওঠে যে ওরা পুলে আগুন লাগিয়ে দেবে—যাতে জিনিসপত্র নিয়ে ওদিক থেকে আর কেউ না আসতে পারে। অমনি এদিককার লোক গর্জে ওঠে, 'এদিকের গরু মোষ আর যেতে দেব? আমরাই আগে পুলে আগুন ধরাব।' এপারের লোকদের মুনীমজি ঠাণ্ডা করে; ওপারের লোকদের করে ইজারাদার সাহেব—পুল গেলে হাট থাকবে কোথায়—

মুনীমজি তাদের বোঝায়, 'দুদিন সবুর করো তো। দেখো না কী হয়। মহাত্মাজি কি আর চুপ করে বসে আছেন? লাটসাহেবকে দিয়ে 'কমিশন' বসিয়েছেন। হেঁজিপেঁজি লাট নয়, খানদানি লোক, রাজার বাড়ির ছেলে।'

সঙ্গে সঙ্গে কথাটা ছড়িয়ে পড়ে। যেখানে যাও সকলের মুখেই ঐ একই কথা, 'কমিশন', 'কমিশন'।

শ্রীপুরের চুয়ালাল রাজবংশীর বুদ্ধিমান বলে খ্যাতি আছে। মুনীমজি সব খবর বলে না নাকি; তাই তাকে সকলে চালের গাড়ির ওপর বসিয়ে সুধানী ইস্টিশনে পাঠায় 'কমিশনে'র খবর আনতে। চুয়ালাল ভয় পাবার ছেলে নয়; সে সোজা পয়েন্টসম্যান সাহেবকে 'কমিশনে'র খবর জিজ্ঞাসা করে। পয়েন্টসম্যান বলেছিল